



দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল: মহুয়া- সংস্কৃতি

Soma Rana

Independent Researcher

West Bengal, India

somarana145@gmail.com

সংক্ষিপ্তসার

আমার প্রবন্ধের বিষয় হচ্ছে জঙ্গলমহলের মহুয়া- সংস্কৃতি। জঙ্গলমহল বলতে আমাদের প্রথমে মনে পড়ে যায় মহুয়া গাছের কথা। তার ফুলের ম ম সুবাসের কথা। তবে মহুয়া গাছ কেবল জঙ্গলমহলকে সমাজে চেনায় না। সে ধরে রেখেছে এই অঞ্চলের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবন কে। আমার প্রবন্ধে আজ আমরা তাই জানবো। কিভাবে মহুয়ার মাদক এখানকার মানুষদের অর্থনৈতিক নির্ভরতা দিয়েছে। বিনিময়ের মাধ্যম হয়েছে। তাছাড়া মহুয়া থেকে শুধু যে মাদক তৈরি হয়, তা নয়। তৈরি হয় পিঠে-পুলি। যেমন 'মহুল কাকরা', 'মহুল পোড়া', 'মহুল কড়াই' ইত্যাদি ছাড়াও আরো কত রকমের খাবার। মহুয়ার ফল 'কচড়া' আদিবাসী অ-আদিবাসী সবার সবজির ঘাটতি পূরন করতো একসময়। এখনও খানিকটা করছে। যেমন 'কচড়া সিজা', 'কচড়া চচ্চড়া' ইত্যাদি। এছাড়া মহুয়া ফলের বীজ থেকে তেল তৈরি হয় এই অঞ্চলে। যার নাম 'কচড়া তেল'। এই তেল কিভাবে জীবন যাপনকে সহজ করেছে। এখনকার সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছে। তাই আজ আমার আলোচনার বিষয়। বিভিন্ন আদিবাসী লোকাচার, উৎসব, ধাঁধা, লোকগান, ঝুমুর ইত্যাদিতে মহুয়া গাছ সহজেই নিজের জায়গা করে নিয়েছে। তাই অরুণ চক্রবর্তী তার গানে বলেছেন- 'লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাজা মাটির দেশে যা...সেখানে গেলে মাদল পাবি মেয়ে মানুষের আদর পাবি। সাহিত্যিকরাও তাদের লেখায় জঙ্গলমহলের সংস্কৃতি বোঝাতে



মহুয়া গাছের কথা এনেছেন। যেমন বিভূতিভূষণের লেখা ও সমর সেনের কবিতায় তার প্রমাণ মেলে। প্রমাণ মেলে লোককবি ভবতোষ শত পথী'র লেখায়। নজরুলের বেশ কিছু গানেও এই মহুয়া গাছের প্রসঙ্গ আছে। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও মানুষ হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়ে মানিয়ে চলে। জঙ্গলমহলের মানুষের কাছেও এই একই নিয়ম খাটে। তারা মহুয়া গাছকে ও তার উপরকরণকে এমন সাদরে গ্রহণ করেছেন। যে আমরা আজ অনায়াসেই বলতে পারি মহুয়া গাছই জঙ্গলমহলের কেন্দ্রবিন্দু, জঙ্গলমহলের রাণী। এককথায় মহুয়া গাছ ছাড়া জঙ্গলমহলের সংস্কৃতি অপূর্ণ।

শব্দসংকেত: জঙ্গলমহলের সংস্কৃতি, মহুয়া সংস্কৃতি, মহুয়া, জঙ্গলমহল

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে তথা ওড়িশা- ঝাড়খন্ড সীমান্তযোঁষা মানুষদের জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে এক সংস্কৃতি, মহুয়াসংস্কৃতি। জঙ্গলমহল মানেই একটা কথা ধামসা- মাদলের তাল, লাল মোরামের রাস্তা, শাল মহুয়ার জঙ্গল, আদিবাসী জনজীবন, মহুয়া ফুলের মন মাতানো সুগন্ধ। যা জঙ্গলমহলকে আলাদা করে আর পাঁচটা জায়গার চেয়ে। পৃথিবীর প্রতিটি জায়গাই তো বৈচিত্র্যে ভরা। খাবারে, পোষাকে, জীবন ধারণে নানা ক্ষেত্রে। এই বৈচিত্র্য গড়ে তোলে মূলত তার আশেপাশের ভৌগোলিক পরিবেশ। যেমন পাহাড়ি অঞ্চল আর সমতল ভূমির খাবার আর ব্যবহার করা জিনিসপত্র এক নয়। তেমনি এক নয় বিভিন্ন জাতির খাওয়া-দাওয়া। আমরা দেখি, পাঞ্জাবে রুটি- ডালের প্রচলন বেশি। আর বাংলাতে মাছ-ভাত জনপ্রিয়। কারণ পাঞ্জাবে গম, ডালের চাষ বেশি। আর বাংলাতে ধান ও নদীতে মাছের কমতি নেই। ঠিক তেমনি এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেও অঞ্চল ভেদে খাবারে-আচারে নানা হেরফের হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় বাংলার জঙ্গলমহলে মহুয়া গাছ সহজলভ্য। আর এই মহুয়া গাছই জীবন ধারণের ভিন্নতা দিয়েছে এখানে। দিয়েছে জীবনে বেঁচে থাকার রসদ। খাদ্য থেকে পানীয়, পানীয় থেকে সবজি, সবজি থেকে তেল, তেল থেকে চলমান জীবনের খুঁটিনাটি সমস্ত কিছুই। কি নারী কি পুরুষ সবাই এর সাথে জড়িত। জড়িত লোকেয়ত জীবনের সংস্কৃতি। আমার এই প্রবন্ধ আজ এই মহুয়া- সংস্কৃতির কথাই বলবে।



আসলে জঙ্গলমহলের রক্ষ লাল কাঁকুরে মাটিতে তেমন ফসল ফলে না। ফলেও বা জমি কই যে চাষ করবে। তাই হয়তো প্রকৃতি মা এদের আশীর্বাদ স্বরূপ দিয়েছেন মছয়া গাছ। মছয়া গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম *Madhuca longifolia*। এটি বৃক্ষ জাতীয় গাছ। আকারে বেশ বড়ো হয়। এবং উচ্চতায় ৩০ থেকে ৪০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। অগ্রহায়ণ মাসে ধান পাকলে যেমন বাঙালির মনে প্রাণে আনন্দ আসে। ঠিক তেমনি জঙ্গলমহলের আদিবাসী জীবনে আনন্দ আসে, মার্চ-এপ্রিল মাসে। কেননা এই সময়ই তো মছয়া ফুলের ঝরে পড়ার সময়। এই ফুল-গাছকে কেন্দ্র করেই মানুষগুলো মেতে ওঠে নানা কর্মব্যস্ততায়।

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকেই মছয়া জঙ্গলের আগাছা পাতা পরিষ্কার করে পুড়িয়ে ফেলেন তারা। তারপর অপেক্ষার প্রহর। ফেব্রুয়ারির শেষ কিংবা মার্চের প্রথম থেকেই ঝরে পড়ে মছয়া। ঝরে পড়ে জীবনধারণের রসদ। চলে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত। ভোর হতেই না হতে আদিবাসী মা শিশুরা বুড়ি হাতে বেরিয়ে পড়েন। মছল কুড়াতে। সূর্যের প্রথম কিরণ পেতেই না পেতে মছল ফুল তার বৃত্ত থেকে ঝরে পড়ে। টুপটাপ করে। জঙ্গল গ্রাম মেতে ওঠে কেমন এক অদ্ভুত মাদকতায়। বিম ধরা জীবনে চঞ্চলতা আসে। ম ম সুবাসে ভ'রে ওঠে মন। মছয়া কুড়াতে কুড়াতে কত কথা হয়, কত গান হয়, কত হাসি খলখল করে ওঠে সেই মছয়া জঙ্গলে। মছলে ভর্তি হয় বুড়ি, বড়ো ধামা। বেলা বাড়তেই মছল পড়া বন্ধ হয়। তারা মছয়া তলায় তাদের আহার সারেন। তারপর পথ চলেন বাড়িমুখো। মায়েরা বুড়ি মাথায় করে অদ্ভুত এক ছন্দে চলতে থাকেন। যেন জীবনের ছন্দ। পুরুষেরাও আসেন। কাঁধে ভার করে নিয়ে যান ধামা ভরা মছল। তারপর তা বাড়ির উঠানের রোদে শুকনো হয় বেশ কিছুদিন। শুকনো হলে বস্তায় ভরে বেঁধে যত্ন করে রাখা হয়। কারণ এই শুকনো মছয়াই তো সারা বছরের মদ তৈরির কাঁচামাল।

মছয়া ফুলের রস থেকে এই যে মাদক তৈরি হয় একে সাঁওতালি ভাষায় বলে 'পাওরা'। মূলত আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা। বিশেষ করে সাঁওতাল কোল মুন্ডা ভিল জাতিভুক্ত মহিলারা এই মাদক তৈরি করে



থাকেন। কারোর জীবিকা আবার কারোর বাড়তি আয়ের উৎস এটি। এটিকে কুটির সংস্কৃতির মধ্যে ফেলা যেতে পারে। বংশপরম্পরায় এই মাদক তৈরির জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেন তারা। যা আমি দেখেছি ও জেনেছি গোপীবল্লভপুর থানার পিতনাউ গ্রামের অর্চনা হেম্বমের মায়ের কাছ থেকে। প্রথমে ৪ কেজি মছয়া, ১ কেজি গুড় আর 'বাখর' (এক প্রকার নেশার পদার্থ যা জঙ্গল থেকে জড়িবিটি এনে চালের গুঁড়োর সাথে মিশিয়ে তৈরি করা হয়।) জলে ভিজিয়ে রাখা হয় চারদিন। চারদিন পর এই ভিজিয়ে রাখা মছয়া, গুড় ও বাখরকে হাঁড়িতে সেদ্ধ করা হয়। এই সেদ্ধ করা হাঁড়ির উপর আর একটা ছোটো ছোটো ছিদ্রযুক্ত মাটির হাঁড়ি রাখা হয়। যার একপাশে তার মত এক বড় ফুটো থাকে। যেখানে এক নল লাগানো থাকে। এই নল লাগানো হাঁড়ির উপর আরও একটা ঠান্ডা জলের হাঁড়ি থাকে। এই প্রত্যেকটা হাঁড়িকে কাদামাটি দিয়ে সিল করা হয়। উনানের জ্বাল পেয়ে যখন মছয়া সেদ্ধ হয় তখন তা ২ ঘন্টার পর বাষ্প হয়ে উপরে উঠতে থাকে। তারপর তা ঠান্ডা জলের হাঁড়িতে বাধা পেয়ে নল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। এবং কাঁচের বোতলে ফোঁটা ফোঁটা করে পড়তে থাকে মদ। এই ৪ কেজি মছয়া ফুলের নির্যাস থেকে ৬ বোতল মদ তৈরি হয়। এই বিশুদ্ধ মছয়ার নির্যাস খাওয়া সম্ভব নয়। তাই এর সাথে ৪ বোতল জল মেশাতে হয়। তৈরি হয় ১০ লিটারের মতো মদ। যা সাঁওতালি মা বউয়েরা জারে ভ'রে হাটে বিক্রি করতে নিয়ে যান। যার দাম $10 \times 90 = 900$ টাকার মত।

এবার প্রশ্ন জাগতে পারে এই মছয়ার মাদক নিয়ে আমার লেখা কতটা উচিত। তবে বলে রাখি লোকসংস্কৃতি শ্রীলতা-অশ্রীলতার ধার ধারে না। বিচার করে দেখে না কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। লোকসমাজে যা প্রচলিত তাই তুলে ধরে। আমিও তাই করছি। এই মছয়ার ফুল থেকে কেবল মাদক তৈরি হয় না, তৈরি হয় পিঠে। সাঁওতাল ভাষায় মছয়াকে বলে 'মাতকম'। আর আঞ্চলিক ভাষায় 'মছল' সাধারণত সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে যে সমস্ত দিকুরা বসবাস করে তারাই এই পিঠে তৈরি করে থাকেন। সাঁওতাল তথা আদিবাসী পরিবারেও এটি হয় তবে খুবই কম। মার্চ-এপ্রিল মাসের ভোরের সময় যখন সাঁওতাল মেয়ে বউরা মাদক তৈরির কাঁচামাল তথা অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে মছল কুড়াতে যায়। তখনও কিছু অ-আদিবাসী শিশুরা বুড়ি হাতে মছল বনে



রওনা হয়। তাদের কাছে এর উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক নির্ভরতা বা মাদক তৈরির কাঁচামাল সংগ্রহ নয়। এ হচ্ছে পিঠে তৈরির জমজমাট আয়োজন।

শুকনো মছয়া দিয়ে মা- ঠাকুমা-দিদিমারা তৈরি করেন নানা পিঠে। যেমন 'মছল কাকরা', 'মছল কড়াই', 'মছল পোড়া', 'মছলের ফুলুরি', 'মছলের পাটিসাপটা' ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। এই পিঠে তৈরির পদ্ধতি বিষয়ে সামান্য ধারণা থাকলেও আরো খুঁটিনাটি জেনেছি পিতানাউ গ্রামের শকুন্তলা রানা, কবিতা রানা, সুচিত্রা রানা, বীরেন রানা, সিদ্ধার্থ রানা, কৃষ্ণ রানা প্রমুখ - র কাছ থেকে। তা নীচে লিখলাম।

'মছল কাকরা' তৈরির জন্য প্রথমে মছয়াকে জলে ভিজিয়ে বেটে নিতে হবে। তারপর উনানে একটা বড়ো পাত্র বসিয়ে ২ লিটার মত জল গরম করে নিতে হবে। সেই গরম জলে মছয়ার বাটা, পরিমাণ মত লবন ও গুড় দিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে। সমস্ত কিছু যখন টকবগ করে ফুটতে থাকবে তখন তার মধ্যে অল্প অল্প করে চালের গুড়ো দিয়ে নাড়তে হবে। মিশ্রনটা ঘন হয়ে গেলে সেটাকে নামিয়ে লুচির মতো বেলে গরম তেলে ভেজে কিংবা ছেকে নিলেই তৈরি গরমা গরম 'মছল কাকরা'।

'মছল পোড়া' তৈরির জন্যও মছল ফুল বেটে নিতে হয়। তারপর তার সাথে গুড়, লবন, চালের গুঁড়ো মিশিয়ে নিতে হয়। অন্যদিকে উনানে একটা মাটির ঢাল বা তাওয়া বসিয়ে ভালো করে গরম করতে হয়। তার উপর কলাপাতা দিয়ে মাখানো মিশ্রনটা ঢেলে দিতে হয়। তার উপর আবার কলাপাতা ঢাকা দিয়ে ১০-১৫ মিনিট জ্বাল দিয়ে উল্টে আবার ৫-৭ মিনিট উনানে বসালেই তৈরি 'মছল পোড়া'।

'মছল কড়াই' আর 'মছল পোড়া'র উপকরণ ও প্রস্তুত প্রণালী প্রায় একই। তবে বিশেষত্ব এই 'মছল পোড়া'তে কলাপাতা দিয়ে পুড়িয়ে পিঠে তৈরি করতে হয়। আর 'মছল কড়াই' তে সেই মছয়া ফুলের বাটা, গুড়, চালের গুঁড়ো এর মিশ্রনটাকে কড়াইতে তেল দিয়ে ঢাকা দিয়ে রান্না করতে হয়।

'মছয়ার ফুলুরি' আর তালের ফুলুরি তৈরির পদ্ধতি প্রায় একই। তবে এখানে তালের বদলে লাগে মছয়ার ফুল।



প্রথমে মছয়ার ফুলকে জলে ভিজিয়ে বেটে নিতে হবে। তারপর সেখানে চালের গুঁড়ো , গুড় কিংবা চিনি, ময়দা, স্বাদমত লবন, মৌরি, কালো জিরে আর সামান্য একটু জল মিশিয়ে একটা মাঝারি শক্ত ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। তারপর এই ব্যাটারটাকে হাতে নিয়ে ছোটো ছোটো বলের মতো করে গরম তেলে ছাড়লেই তৈরি গরম গরম 'মছয়ার ফুলুরি'।

'মছয়ার পাটিসাপটা'- র প্রচলন এই অঞ্চলে কম তবে কেউ কেউ এটি তৈরি করে থাকেন। 'মছয়ার পাটিসাপটা' তৈরির জন্য প্রথমে নারকেলের পুর তৈরি করে নিতে হবে। এরপর ৫০০ গ্রাম মছয়াকে পাতলা করে বেটে তার মধ্যে ২০০ গ্রাম চালের গুঁড়ো ও লবন মিশিয়ে একটা মাঝারি ঘন মিশ্রণ তৈরি করে নিতে হবে। তারপর তাওয়ায় সামান্য একটু তেল দিয়ে মিশ্রণটা পাতলা করে মেলিয়ে নিতে হবে। এবং ১ মিনিট ঢাকিয়ে রাখতে হবে। এরপর পিঠের মাঝ বরাবর নারকেলের পুর দিয়ে দু'দিকে ভাঁজ করে দিলেই তৈরি 'মছয়ার পাটিসাপটা'। পিঠে ছাড়াও একসময় এই অঞ্চলে আরো কিছু খাবার তৈরি হত। এখন হয় না বললেই চলে। যেমন 'মছলনাডু', 'মছল সিজা'।

এই অঞ্চলে কোনো ঠাকুমা গোছের মানুষের কাছে দু-দন্ড বসলে তিনি তার অতীতের গল্প করতে করতে বলেন - "ছা ম্যানে বড্ড ভোকে হি থান। সতবা তো আর অত খাবার থায় নি। গটায় গটায় 'মছল নাডু' ধরাই দিনে সেম্যানে বুলি বুলি খাই থান।" গল্পের ফাঁকে জেনেছি এর প্রস্তুত প্রণালী। এই 'মছল নাডু' তৈরির জন্য প্রথমে মছয়া ফুলটিকে ভালো করে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। কিছুদিন পর শুকিয়ে গেলে সেগুলোকে কড়াইতে নেড়ে নিতে হবে। তারপর ঢেঁকিতে কুটতে হবে। কুটার সময় এর সাথে খই/ মুড়ি কিংবা ছোলা-মুগ ভাজা দিতে হবে। তারপর সেটিকে লাড্ডুর মতো হাত দিতে বল বানিয়ে নিতে হবে। তৈরি 'মছলনাডু'। এটি প্রায় ১ মাস সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

'মছল সিজা' রান্না হত মূলত সন্ধ্যা বেলা। আঞ্চলিক ভাষায় 'সিজা' মানে হচ্ছে সেদ্ধ। মছয়া সেদ্ধ



জন্য হাঁড়িতে গরম জলে ধুয়ে রাখা মছার ফুল , অড়হর ডাল, ছোলার ডাল, তেঁতুলের বীজ, চিনা বাদাম, মুগ ডাল, লবন , সামান্য তেল দিয়ে সেদ্ধ করতে হয় । জল কমে গেলে সেটাকে নামিয়ে খই ও গুড় মাখিয়ে নিতে হয়। তৈরি 'মছল সিজা'। মছার সেদ্ধ যে জঙ্গলমহলের অভাব অনটনের সঙ্গী ছিল, তা লোককবি ভাবতোষ শতপথী তাঁর 'ভাদরিয়া বুম্যর'এ লিখেছেন -

“ পেটে নায়ঁ যার দানাপানি-

সে কি বইলবেক বুম্যর শুনি ?

গিয়ান হারায়ঁ জুঁঠা খাছে মানুষে কুকুরে ।

ভখে শুঁখায় গেছে নাড়ি-

বুড়ায় গেল জুআন্ বহ্ ডি-

মছল সিঝা, জইনহ্যার্ গুঁড়ি নায়ঁখ কিছুই ঘরে।”...

এই হচ্ছে মছার ফুল দিয়ে নানা রকমের পিঠে খাবার। গাছের টাটকা মছল বেটেও পিঠে তৈরি করা যায়। তবে শুকনো মছা দিয়ে মূলত পিঠে তৈরি করা হয়। কেননা কাঁচা মছার ফুলে সামান্য নেশার ভাগ থাকে। শুকিয়ে গেলে তা থাকে না বললেই চলে। বয়স্কদের মতে এই মছল পিঠে-পুলি খেলেই নাকি ক্লান্তি , বাতের সমস্যা ও ব্যাথা বেদনা দূর হয়।

এপ্রিলের শেষে তো মছল ফুল পড়া শেষ হল। এবার ফলের পালা। জুন - জুলাই মাসে মছা গাছে আমড়ার মতো থোকা থোকা ঝুলতে থাকে ফল। নাম তার 'কচড়া'। কি আদিবাসী কি অ-আদিবাসী একসময় সবার সবজির ঘাটতি পূরণ করতো এই কচড়া। আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়ার কারনে যদিও এর প্রচলন কমে গেছে। তবুও পুরানো দিনে ঠাকুমা দিদিমা- রা এই 'কচড়া'-কে বিভিন্ন ভাবে রান্না করে খেতেন। যেমন 'কচড়া সিজা'



(ছেঁচকি), 'কচড়া চচ্চড়া', 'কচড়া পোস্ত', 'কচড়া ঘন্ট' ইত্যাদি। কচড়া ছেঁচকিকে এই অঞ্চলের মানুষেরা বলেন 'কচড়া সিজা'। সিজা মানে সেদ্ধ। এই 'কচড়া সেদ্ধ' মূলত ভাত কিংবা পান্তা ভাতের সাথে খাওয়া হত। এটি তৈরির জন্য প্রথমে মছয়ার গাছ থেকে তার ফল 'কচড়া' সংগ্রহ করে আনতে হবে। তারপর সেটির খোসা ছাড়িয়ে তার বীজ বার করে দিয়ে ছোটো ছোটো কুচি করে কেটে নিতে হবে। এরপর সেই কাটা কচড়া গুলোকে নুন, হলুদ ও সামান্য তেল দিয়ে সেদ্ধ করে নিতে হবে। অন্যদিকে উনানে কড়াই বসিয়ে তাতে তেল, স্বাদমত লবন, শুকনো লক্ষা আর রসুন খেঁতো ভেজে নিতে হবে। ভাজা হলে সেদ্ধ কচড়া ও বাটা সরিষা দিয়ে কিছুক্ষন খুন্তি নাড়লেই তৈরি 'কচড়া সিজা'। 'কচড়া চচ্চড়ি'র জন্যও প্রথমে কচড়াকে নুন হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করে নিতে হবে। কেননা কচড়া স্বাদে একটু কষাটে হয়। এরপর কড়াইতে সরিষা তেল দিয়ে সেখানে আলু- কুন্দরি (তেলেকুচা) ভেজে নিতে হবে। তারপর পাঁচফড়ন, তেজপাতা, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচালক্ষা, টমেটো, হলুদ, লবন দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে। এরপর এর মধ্যে সেদ্ধ কচড়া ঢেলে জিরে বাটা, সরিষা বাটা দিয়ে কিছুক্ষন কষিয়ে সামান্য একটু জল দিয়ে ঢাকা দিলেই তৈরি 'কচড়া চচ্চড়ি'। এভাবেই কচড়াকে নানা হেরফের করে মশলা পাতি বাড়িয়ে কমিয়ে নানা ভাবে রান্না করা হয়। যেমন 'কচড়া পোস্ত', 'কচড়া ঘন্ট' সেগুলি আর বিস্তারিত লিখলাম না। কারণ প্রবন্ধের শব্দ সংখ্যা যে সীমিত।

আমরা এর আগের আলোচনায় দেখলাম মছয়া ফুল দিয়ে কেবল মাদক তৈরি হয় না। তৈরি হয় পিঠে, লাড্ডু। এছাড়াও মছয়ার ফল বা 'কচড়া' সবজি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এখানেই এর ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা নয়। মছয়া গাছের আরো নানা বিবিধ ব্যবহার আছে। মছয়া গাছে ফুল ফুটলো, ফল হল। এবার এই ফল পেকে গেলে তার ভেতর থেকে এক প্রকার বীজ বের হয়। যা থেকে এক ধরনের তেল তৈরি হয়। নাম 'কচড়া তেল'। একসময় এই তেল তৈরির জন্য এই অঞ্চলের মানুষরা এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। এখন তা নেই বললেই চলে। তবে কোনো কোনো গ্রামের আনাচে-কানাচে তা থাকতেও পারে। পদ্ধতিটি হল প্রথমে পাকা কচড়ার ভেতর থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। এই বীজ অনেকটা কাঁঠাল বীজের মতো দেখতে হয়। বীজটা

মাঝ বরাবর কেটে রোদে শুকাতে হবে । কিছুদিন রোদে শুকিয়ে গেলে সেগুলোকে টেকিতে কুটে নিতে হবে । কুটা হয়ে গেলে কাপড়ের পুঁটলিতে বেঁধে ঝুড়িতে দিয়ে বাষ্প সেদ্ধ করতে হবে । তারপর সেদ্ধ কচড়া বীজের ঢেলাটাকে কাপড়ের পুঁটলি সমেত একপ্রকার কাঠের জাঁতাতে রেখে চার পাঁচজন মিলে জোরে চাপ দিতেই বেরিয়ে আসে তেল । কচড়া তেল । মূলত দুই-তিন পুরুষ আগেকার মানুষেরা এই তেলকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রান্নার কাজে ব্যবহার করলেও, বর্তমানে এটি সাধারণত গায়ে মাখার কাজে, বাতের ঔষধ হিসেবে, গৃহপালিত পশুর কাজে ও প্রদীপ জ্বালানোর কাজে ব্যবহৃত হয় । এছাড়া সাঁওতাল সম্প্রদায়ে গোরু বিক্রির সময়ে এই তেল গোরুর শিং-এ লাগিয়ে বেচার প্রথা আছে । বাঁধনা পরবেও এই তেলের গুরুত্ব আছে । মছ্যার বীজ থেকে তেল তৈরির পর, যে অবশিষ্ট অংশটুকু পড়ে থাকে তাকে মছ্যার খৈল বা রোটেনন বলে । এটি পুকুরে মাছ চাষের সার হিসেবে ব্যবহৃত হয় । এর সাহায্যে পুকুরের অচাষযোগ্য মাছ বা রান্ধুসে মাছ মারা হয় । পুকুর হয়ে ওঠে মাছ চাষের উপযোগী । সাঁওতাল লোকাচারেও এই মছ্যার খৈল- এর গুরুত্ব অনেকখানি । তিলক মাটির সাথে এই মছ্যার খৈল মিশিয়ে ঘাটের দিন মাথায় মেখে স্নান করলে তাদের মৃত্যুকালীন অশুচ কাটে ।

এছাড়া মছ্যা ফুলের নির্যাস থেকে মাদক তৈরির পর যে অবশিষ্ট অংশ গুলো পড়ে থাকে । সেগুলি গোরু মহিষের খোল হিসেবে ব্যবহৃত হয় । তাছাড়া মছ্যা হচ্ছে বৃক্ষ জাতীয় গাছ । ফলে এই মছ্যা গাছের শক্ত কাঠ দিয়ে ঘর বাড়ির আসবাবপত্র, জানালা, দরজা, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি তৈরি হয় । মছ্যা গাছ যে জাতিকে যে অঞ্চলকে আগলে রেখেছে খুব স্বভাবিক সেই জাতির উৎসবে , ভাবনায়, সাহিত্যে তারও কদর থাকবে । আছেও । মছ্যা গাছকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে ধাঁধা ও লোক উৎসব দেখা যায় । মানভূম অঞ্চলে যে মছল কেন্দ্রিক ধাঁধা প্রচলিত আছে । -

“ মা , বিটির একই নাম,

ডুমকা ছড়ার ভিনু নাম ।”

এর উত্তর মছ্যা গাছ । মছ্যার ফুল এবং তার ফল কচড়া । এখানে মা ও বিটি (মেয়ে) বলতে মছ্যা গাছ ও



মহুয়া ফুলকে বোঝানো হয়েছে । ডুমকা ছড়া (ছেলে) বলতে মহুয়া ফল অর্থাৎ কচড়া -কে বোঝানো হয়েছে ।
এই একই ধাঁধা এই অঞ্চলেও প্রচলিত । তবে এই অঞ্চলটি যেহেতু উড়িষ্যা- ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী অঞ্চলে
অবস্থিত । সে কারণে এই ধাঁধা আলাদা ভাষারূপ লাভ করেছে । এখানে এটি -

“মা কির গটায় নাম

পোঅ মেনকার আলধা নাম I”

সাঁওতালরা এই মহুয়া গাছকে ‘জাহের এরা দেবী রূপে পূজা করে থাকেন । তাদের মতে ইনি হচ্ছেন মারাং
বুরুর স্ত্রী I এছাড়া সরহুল উৎসবে মহুল ফুল ও শাল ফুল দিয়ে পূজো করা হয় । এই সরহুল উৎসবের গানেও
এই মহুল গাছের প্রসঙ্গ এসেছে । যা ধীরেন্দ্রনাথ বাক্সে তার ‘পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ প্রথম খন্ডের ১৪০
নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন । -

“সারি সারজং বুটারিগি জাহের তাবং

সারজং বাহা বাহাঞ্চ

মাতকম বাহা গেলে গেলে এন

সারি সারজং বুটারিগি জাহের তাবং

সানাম বাহা বাহাঞ্চ

সানাম বাহা মসরং

ইঞ্চ চ বাহাঞ্চ ।”

যার বাংলা মানে করলে এই দাঁড়ায় -

“সত্য শাল গাছের নীচে আমাদের জাহের

শাল ফুল আমি পরি

মহুয়া ফুল ধরেছ



সত্য শাল গাছের নীচে আমাদের জাহের

সমস্ত ফুল আমি পরি

সমস্ত ফুল শুকিয়ে যায়

আমি যে ফুল পরি ।”

পাতা উৎসবেও মছয়া ফুলকে পূজা করা হয়। এছাড়া আষাঢ়ি পূজাতে হাঁড়িয়া যদি না থাকে তার বদলে মছয়ার নির্যাস নৈবেদ্য দিয়ে পিতৃপুরুষের সন্তুষ্টির রীতি আছে। তিনটে খোলার উপর মদ দিয়ে বলা হয় – “নৌয় পারম গাড়া পারম হাড়ামক বুডিক সাঁকরাত যুতোমতেলে চড়ররাপে কানা কুড়ৌ কোওপে নায় বাড়ে নাপায় বাড়ৈলে অহকৌ মালে ।” যা আমি পিতানাউ গ্রামের সোনামনি হেম্বমের কাছ থেকে জেনেছি । পূজার শেষে সেই মাদক প্রসাদ হিসেবে খাওয়া হয় ।

মৃত্যুকালীন লোকাচারেও মছয়া গাছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । যা আমি জেনেছি পিতানাউ গ্রামের সাঁওতালদের প্রধান চন্দ্র সরেন- এর কাছ থেকে । কোনো নবজাত শিশু মারা গেলে তাকে মছয়া গাছের তলায় কবর দেওয়া হয়। এবং মছয়ার ডাল একটু ঢেঁছে দেওয়া হয় । তার থেকে যেন ফোঁটা ফোঁটা করে মছয়ার সাদা খির কবরের উপর পড়তে থাকে । মছয়ার সাদা খির মাতৃদুগ্ধ ভেবে শিশু যেন ভুলে থাকে । এছাড়া বয়স্কদের চিতার উপর তিনটে মছয়ার কাঠ আর মছয়ার পাতার আবরণ দেওয়ার রীতি আছে । এই হাতে গোনা গুটি কয়েক ধাঁধা, উৎসব, লোকাচারের কথা বললে এর বিস্তার বোঝানো সম্ভব নয় । এই অঞ্চলের আনাচে কানাচে লুকিয়ে আছে মছয়ার আরো কত ধাঁধা, কত প্রবাদ , কত গল্প যেগুলি জানার জন্য গভীর সমীক্ষার প্রয়োজন । বাংলা সাহিত্যেও এর বিস্তার কম নয় । জঙ্গলমহলের সংস্কৃতি বোঝাতে সাহিত্যিকরা বারে বারে মছয়া গাছের কথা এনেছেন । বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় তাঁর ‘বনে পাহাড়ে তে লিখেছেন-

... “আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম-এই বন, পাহাড়ের মধ্যে ক্ষুদ্র হাটটি কেমন, কি জিনিস এখানে কেনাবেচা হচ্ছে দেখতে হবে বৈকি। আমরা সবাই হাটের মধ্যে বেড়াচ্ছি, একটা মছয়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কয়েকটি হো-

তরুণী আমাদের দিকে চেয়ে হাসতে দেখে আমরা এগিয়ে গেলাম তাদের কাছে ।”...

শুধু মছয়া গাছ নয় । মছয়ার তেল, মছয়ার মাদক তৈরির প্রধান উপকারণ ‘বাখর’ও যে হাটে সাদরে বিক্রি হয় । তা তিনি এখানে বলেছেন – ...“বিক্রী হচ্ছে যা গোটা সিংভূমের হাটে সাধারণতঃ বিক্রী হয়ে থাকে । বীচিওয়ালা বেগুন, টোম্যাটো ও পেঁয়াজ, শুটকি মাছ, জোঁদা অর্থাৎ নালসে পিঁপড়ের ডিম, বাখর অর্থাৎ মছয়ার মদ তৈরী করবার মশলা-দেখতে কদমার মত ; সুন্দর সরু শীতশাল চাল, মাটির হাঁড়িকুড়ি, মছয়ার তেল, করনজোর তেল এবং তাতে তৈরী মোটা কাপড় ও গামছা ।”

এছাড়া কবি-লেখকরা শহর যান্ত্রিকতার জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মছয়া বনের স্বপ্ন দেখেছেন ।

কবি সমর সেন তাঁর ‘মছয়ার দেশ’ কবিতায় বলেছেন –

“ আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মছয়া-ফুল

নামুক মছয়ার গন্ধ ।”

শুধু গদ্য কবিতা নয়, গানেও এর প্রভাব অনেক । নজরুলের বেশ কিছু গানে যেমন –

১. 'মছয়া বনে বন-পাপিয়া'
২. 'মছয়া বনে লো মধু খেতে, সই'
৩. 'মছয়া ফুলের মদির ঘন সুবাসে, নয়ন ঝিমিয়ে আসে'
৪. 'এসো ঠাকুর মছয়া বনে ছেড়ে বৃন্দাবন'
৫. 'ওরে ডেকে দে, দে লো মছয়া বনে ফুল ফোটাতে বাজিয়ে বাঁশি কে'
৬. 'মছয়া বনে আধো নিশীথ রাতে বেনুকা বাজায়ে, ডাকে গো মোর কোন বিরহী'
৭. 'কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া
কুহরিল মছয়া-বনে
চমকি জাগিনু নিশীথ শয়নে ॥'
৮. 'মছয়া গাছে ফুল ফুটেছে নেশার ঝোঁকে ঝিমায় পবন'



বিভিন্ন লোকগানে ও ঝুমুর গানে মল্লয়া তার জায়গা করে নিয়েছে। যেমন–

১. "বনে বনে ফুটেছে মল্লয়া রে

গাছে গাছে ফুটেছে মল্লয়া

পলাশ- শিমূল মউবনে

ভাঙা মনে যৌবনে

বনে বনে ফুটেছে মল্লয়া রে।”

২. "শাল কাঁদে পিয়াল কাঁদে, কাঁদে মল্লল বন”

৩. "শাল মল্লল পিয়াল বন নাচে ওঠে আমাদের মন।”

৪. "চৈত্র মাসের শেষে মল্লয়া ফুল ফুটিলো।”

৫. "শাল পলাশের মল্লল বনে আর কোকিল ডাকে আপন মনে I”

জঙ্গলমহলের সাথে মল্লয়া গাছ যে কেমন নিবিড় ভাবে জড়িয়ে আছে এটা বুঝতে হলে একটা ঘটনা জানতে হবে। অরুণ চক্রবর্তী ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর স্টেশনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানকার মল্লয়া গাছ ও ফুলকে দেখে তার বড্ড বেমানান মনে হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল বাংলার ধান, আলু উৎপাদনের অঞ্চলে মল্লয়া গাছ ও ফুল কেন থাকবে। মল্লয়া তো লাল পাহাড়ের অর্থাৎ ‘জঙ্গলমহলের রাণি I ওকে তো সেখানেই মানায়। তারপর তিনি এই গানটি রচনা করেন। —

“হ্যায় দ্যাখো গ তুই ইখানে কেনে, লাল পাহাড়ির দেশে যা

রাঙা মাটির দেশে যা

হেথাকে তুকে মানাইছে নাই গ, ইক্কেবারে মানাইছে নাই

অ- তুই লাল পাহাড়ির দেশে যা...



সিখান গেলে মাদল পাবি

মেইয়ে মরদের আদর পাবি

অ- তুই লাল পাহাড়ির দেশে যা..."

শুধু লোকগান নয়, বিভিন্ন আধুনিক গান ও ব্যান্ডের গানে মহুয়ার কথা আছে। লোকগীতি লোকাল অ্যালবাম এর সেই বিখ্যাত গান-"ফাগুনেরো মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায়।"এছাড়া অডেসি পরিবেশিত " মহুয়া বনে দেখেছি তারে এলোচুল ঘুঙুর বাঁধা"। প্রমিথিউস পরিবেশিত "একদিকেতে মহুয়া বন"। এছাড়া সদ্য প্রকাশিত টি-সিরিজ বাংলার একটি গান 'মহুয়ার নেশা। আরো কত কিছু যে আড়ালে থেকে গেল। যেগুলি খুঁজে দেখাবার জন্য বিস্তর সময় আর বিস্তর ভাবনার প্রয়োজন।

সবশেষে বলা চলে মহুয়া গাছ এই অঞ্চলের মানুষদের অর্থনৈতিক নির্ভরতা দিয়েছে। দিয়েছে বেঁচে থাকার রসদ। ধরে রেখেছে জঙ্গল মহলের লোকসংস্কৃতি, লোকাচার, লোক উৎসব, ধাঁধা, গান প্রভৃতির সাথে এটি নিবিড় ভাবে জড়িত। মহুয়া গাছ ছাড়া জঙ্গলমহলের সংস্কৃতি অপূর্ণ। শুধু তাই নয় এই মহুয়া ফুল একসময় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। এখনও তা কিছু কিছু গ্রামে আছে। গ্রামে গ্রামে যখন ফেরি করা দল আসে। মুদিখানার জিনিস থেকে কাপড় , গিলটি গয়না। তখন আদিবাসী মায়েদের মন হয়ে ওঠে মহুয়া ফুলের মতো চঞ্চল। কিন্তু হাতে যে পয়সা নেই। তাতে কি হয়েছে ? তারা অবলম্বন করেন সেই প্রাচীন যুগের বিনিময় প্রথা। জিনিসের বদলে জিনিস। বুড়ি ভরে শুকনো মছল ঢেলে দেন বিক্রেতার বস্তাতে। তারা ঠকেন। কিন্তু তার হিসেব রাখেন না তারা। গ্রামের কথা যখন এলো তখন বলি এই মহুয়া গাছ কে ভিত্তি করে এই অঞ্চলের অনেক গ্রামের নামকরণও হয়েছে। যেমন 'মছলবনী' নামে বেশ কিছু গ্রামও রয়েছে এখানে। লোককবি ভবতোষ শতপথীর 'দরবারি কুম্যুর' লেখাতেও এই ধরণে গ্রামের কথা আছে - "মছলবনি গাঁয়ে একটাও মছল গাছ নয় ভায় ।"



আজকে আমরা এই "দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল: মছয়া সংস্কৃতি" প্রবন্ধে দেখলাম মছয়া দিয়ে লোকপনীয় মাদক তৈরি, পিঠে পুলি তৈরি, কচড়ার সবজি তৈরি, কচড়ার তেল তৈরি; ধাঁধা, সাঁওতাল মানুষদের মছয়া গাছকে দেবীরূপে পূজা করা। বিনিময় প্রথা ইত্যাদি নানা কিছু। তাই তো বলা চলে মছয়া গাছ জঙ্গল মহলের রানী। তাকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলের তথা এই প্রান্তের জীবন-জীবিকা- সংস্কৃতি-উৎসব সমস্ত কিছুই। এই মছয়া গাছই এই অঞ্চলের লোকসমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছে, বাঁচিয়ে রেখেছে ঐতিহ্যকে।

কিন্তু দিনে দিনে ফাস্টফুডের প্রতি আকর্ষণের ফলে পিঠে পুলি যেমন হারাচ্ছে তেমনি হারাচ্ছে মছল পিঠা। এই অঞ্চলের বৃদ্ধারা দুঃখ করে বলেন - "অতবাকার ছ্যা গা না জ্যাঁয়েন মছল পিঠার স্বাদ, না জ্যাঁয়েন কচড়ার তরকারি।" খাদ্যই একটা সমাজকে, একটা সংস্কারকে, একটা যুগের ঐতিহ্যকে ধরে রাখে। খাদ্যই এক প্রজন্মকে আর এক প্রজন্মের সাথে বাঁধে। কিন্তু এই বন্ধন ধীরে ধীরে ছিঁড়তে শুরু করেছে। তাছাড়া কিছু স্বার্থপর মানুষ মছয়ার শক্ত কাঠের লোভে তা কেটে ফেলছেন। তাই তো লোককবি ভবতোষ শতপথী তার 'অরন্যের কাব্যে' দুঃখ করে বলেছেন- "বর্ণময় অট্টালিকা নিহত নিসর্গ- অন্তরালে/ ছিন্ন শাল- মছলের শবদেহ ব্যবচ্ছেদ চলে"। সরকার থেকেও নতুন চারাগাছ লাগানো ও সংরক্ষণের তেমন কোনো ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। আমার এই প্রবন্ধটি পড়ে জঙ্গলমহলের মানুষ যদি নিজের ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত হন। নবপ্রজন্ম যদি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়া এই মছয়ার পিঠে ও কচড়ার সবজির প্রতি উৎসুক প্রকাশ করেন। তাহলে আমার এই লেখাটি সার্থক বলে মনে করবো।



গ্রন্থপুঞ্জি ও তথ্যসূত্র

- বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ (২০১৮). *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, প্রথম খন্ড*. বাস্কে পাবলিকেশন, সপ্তম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৪০
- শতপথী, ভবতোষ (২০১৮). *ভবতোষ রচনা সমগ্র, প্রথম খন্ড*. সম্পাদনা ফটিক চাঁদ ঘোষ, বর্ণমালা প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ, ১ লা বৈশাখ, ১৪২৫ (১৫ ই এপ্রিল, ২০১৮)
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০১২) *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রন
- সেন, সৌমেন, (জানুয়ারি, ২০০৮). *লোকসংস্কৃতি তত্ত্ব-পদ্ধতি*. অঞ্চলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, চট্টোপাঠ্যায়, তুষার, *লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা*, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা
- বন্দ্যোপাঠ্যায়, বিভূতিভূষণ, (চৈত্র ১৩৬৭). *দিনের পরে দিন*. মিত্র ও ঘোষ পাথলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরন দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ: চৈত্র ১৩৬৭, পৃষ্ঠা ২৬ (বনে- পাহাড়ে)
- বসু, বুদ্ধদেব . *আধুনিক বাংলা কবিতা*. এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স (প্রাইভেট) লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ১২, পৃষ্ঠা ২২৪ (মহয়ার দেশ)

বৈদ্যুতিন মাধ্যম :

- Administrator. (n.d.). *মহয়া বনে লো মধু খেতে সহি*. Nazrulgeeti.Org. Retrieved 20 September 2026, from <https://nazrulgeeti.org/#/schema/WebPage/base>
- Administrator. (n.d.-a). *মহয়া ফুলের মদির ঘন সুবাসে*. Nazrulgeeti.Org. Retrieved 20 September 2026, from <https://nazrulgeeti.org/#/schema/WebPage/base>



Calcutta News. (2021, June 12). *মহুয়া ফল থেকে তৈরি হচ্ছে খাঁটি 'কচড়া' তেল* [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=xwcAHBZqnDo>

David, P. (2021, July 30). *Slowly Dropped the Mahua in Umaria*. PARI - People's Archive of Rural India. <https://ruralindiaonline.org/article/slowly-dropped-the-mahua-in-umaria>

Dey, A., & Chakraborty, J. (2024, January 10). *মহুয়ার নেশা, মহুয়ার অর্থনীতি ও সংকট*. Boneypahare. <https://www.boneypahare.com/post/mahuar-nesha-mahuar-arthoniti-o-sangkat>

Grow Billion Trees Team. (2026, January 15). *Indian mahua tree: Nature's hidden treasure & cultural heritage*. Grow Billion Trees. <https://growbilliontrees.com/blogs/tree-stories/indian-mahua-tree-the-hidden-treasure-of-natures-bounty-and-cultural-heritage>

Madhuca longifolia. (2023, January 3). Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Madhuca_longifolia

Pugdunde safaris.com. (2024, April 4). *What makes Mahua the most popular tree in Central India*. Pugdundee Safaris Blog | Wildlife Travel Insights, Safari Guides, and Jungle Experiences. <https://www.pugdunde safaris.com/blog/mahua-tree-in-central-india/>

Satt Academy. (n.d.). *মহুয়ার খেল কী? (জ্ঞানমূলক)*. SATT. Satt Academy. Retrieved 20 September 2026, from <https://sattacademy.com/question/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A7%>



9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%96%E0%A7%88%E0%A6%B2-
%E0%A6%95%E0%A7%80

Seal, K. (2021, July 13). *ভোজ্য তেলে আগুন, মহুয়ার কচড়া তেলে রান্না আদিবাসীদের*. Eisamay Online.

<https://eisamay.com/west-bengal-news/durgapur-news/massive-price-of-mustard-oil-villagers-uses-mahua-oil-for-cooking/articleshow/84367151.cms>

Thakur, P. (2023, August 28). *Banking on mahua in Chhattisgarh*. PARI - People's Archive of Rural India. <https://ruralindiaonline.org/article/banking-on-mahua-in-chhattisgarh>

The Locavore Team. (2024, December 18). *Wild harvest: Sustaining livelihoods through Mahua Flowers in Jharkhand - the locavore*. The Locavore. <https://thelocavore.in/2024/12/18/wild-harvest-sustaining-livelihoods-through-mahua-flowers-in-jharkhand/>

The Mahua Story. (n.d.). Fountainink. In. Retrieved 20 September 2026, from <https://fountainink.in/interactive/the-mahua-story/>

মহুয়া. (2025). In *Wikipedia*. <https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE>

লাল পাহাড়ির দেশে যা. (2024). In *Wikipedia*.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :



১. চন্দ্র সরেন, পিতার নাম- বাসুদেব সরেন, গ্রাম পিতানাউ , পোষ্ট- মছলবনী ,পিন-721506, থানা-গোপীবল্লভপুর
,জেলা- ঝাড়গ্রাম, মোবাইল নং-6295527338

২. শকুন্তলা রানা,পিতার নাম-কৃষ্ণ চন্দ্র পৈড়া , গ্রাম পিতানাউ, পোষ্ট- মছলবনী ,পিন-721506, থানা-
গোপীবল্লভপুর ,জেলা- ঝাড়গ্রাম, মোবাইল নং-8927163636

৩. বীরেন রানা, পিতার নাম-প্রসন্ন কুমার রানা, গ্রাম পিতানাউ পোষ্ট- মছলবনী ,পিন-721506, থানা-
গোপীবল্লভপুর ,জেলা- ঝাড়গ্রাম, মোবাইল নং-8001885810

৪. সিদ্ধার্থ রানা, পিতার নাম- গোবর্ধন রানা, গ্রাম পিতানাউ পোষ্ট- মছলবনী ,পিন-721506, থানা-গোপীবল্লভপুর
,জেলা- ঝাড়গ্রাম, মোবাইল নং- 9474628721

৫. নাসমনি হেমব্রম ,স্বামী- বুধিয়া হেমব্রম, গ্রাম পিতানাউ, পোষ্ট- মছলবনী, পিন-721506, থানা-গোপীবল্লভপুর
,জেলা- ঝাড়গ্রাম,